দিবস

সুস্বাস্থ্যই জীবনের নতুন প্রত্যাশা

ইকবাল মাসুদ

আফিম ও আফিম জাতীয় নেশা দ্রব্যের সর্ববৃহৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো হচ্ছে– মিয়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ড সীমান্ত এলাকা নিয়ে গঠিত গোল্ডেন ট্রায়েঙ্গল, পূর্ব ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকা– যা গোল্ডেন ওয়েজ এবং পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সংলগ্ন কিছু এলাকা গোল্ডেন ক্রিসেন্ট বলে পরিচিত। আফিম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র এবং আফিমজাত দ্রব্য যেমন হেরোইন ইত্যাদি এ এলাকাগুলোতে উৎপাদন হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র পাচার হয়ে থাকে। জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধবিষয়ক অফিস (ইউএনওডিসি) কর্তৃক ২০১২ সালে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ড্রাগ রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১১ সালে ৭ হাজার টন আফিমজাত দ্রব্য উৎপাদন হয়েছে, যা ২০১০ সালে ছিল ৪ হাজার ৭০০ টন। এ সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও উৎপাদন বেড়েছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, রাসায়নিকভাবে তৈরি মাদকের উৎপাদন ও ব্যবহার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে, যা আন্তর্জাতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। ২০১০ সালে বিশ্বের মোট ২৩ কোটি মানুষ একবারের জন্য হলেও অবৈধ মাদক গ্রহণ করেছে, যা বিশ্বের মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ৫ ভাগ। এর মধ্যে সমস্যাগ্রস্ত মাদক গ্রহণকারীর সংখ্যা ২ কোটি ৭০ লাখ এবং বিশ্বের মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ০.৬ ভাগ। ফলশ্রুতিতে অবৈধ মাদক গ্রহণের কারণে প্রতি বছর ২ লাখ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। মাদক ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতিগুলো গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। এছাড়া মাদক ব্যবহার ও বাণিজ্যের কারণে সন্ত্রাস, অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং এইচআইভির মতো সমস্যাগুলো ত্বরান্বিত হচ্ছে। অবৈধ মাদক ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় এ ব্যবসা কিছু লোককে সর্বদাই আকৃষ্ট করছে। বলা হয় যে, এ অবৈধ ব্যবসায়ে বছরে প্রায় ৩২১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লেনদেন হয়ে থাকে। তন্মধ্যে মাত্র ১০ ভাগ উৎপাদন, বাজারজাত ও সরবরাহে ব্যয় করে। বাকি কালো টাকা আন্তর্জাতিক অর্থ বাজারে খাটানো হয়। যেখানেই রাজনৈতিক অস্থিরতা আছে, বিদ্রোহ আছে কিংবা অন্য কোনো অশান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, সেখানেই অবৈধ মাদক ও অস্ত্র ব্যবসা জমজমাট হয়। কারণ সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী অনেক গ্রুপ এ ব্যবসায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এসব কারণে মাদক ব্যবসালব্ধ অবৈধ টাকা সারা বিশ্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের জন্য, মাদকের প্রতি যুব সম্প্রদায়ের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি বলে, মাদকের শিকারও তারা বেশি হয়।

মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার বর্তমান শতাব্দীর জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেয়ায়, তা প্রতিরোধের জন্য ১৯৮৭ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজুলেশন ৪২/১১২ ধারা অনুসারে ২৬ জুন বিশ্বব্যাপী 'মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মাদক নিয়ন্ত্রণবিষয়ক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

উন্নয়নশীল দেশে অবৈধ মাদকের ব্যবহার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এর মধ্যে ২০১০ সালের তথ্যানুসারে আনুমানিক ২০ ভাগ মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি চিকিৎসা গ্রহণ করেছে। নারী মাদক নির্ভরশীলদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা গ্রহণের হার অত্যন্ত নগণ্য।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান মাদক দ্রব্য উৎপাদনকারী দেশের সীমান্তের কাছাকাছি। যেমন একদিকে রয়েছে মিয়ানমার ও অন্যদিকে রয়েছে ভারত। তাছাড়া বিশ্বের সর্বাধিক আফিম উৎপাদনকারী দেশ আফগানিস্তানের দূরত্বও খুব বেশি নয়। মিয়ানমার থেকে আসছে হেরোইন ও ইয়াবা, ভারত থেকে আসছে ফেনসিডিল। আফগানিস্তানে উৎপাদিত হেরোইনের চালান পাকিস্তান, ভারত হয়ে বাংলাদেশে আসে। এছাড়া আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের একটি অন্যতম করিডোর হিসেবে বাংলাদেশ ব্যবহৃত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। দেশের অভ্যন্তরেও কোনো কোনো স্থানে মাদক উৎপাদন এবং বেশ কিছু এলাকায় পপি চাষের মাধ্যমে আফিম ও হেরোইন উৎপন্ন হওয়ার কথা জানা যায়। এর ফলে মাদকের সহজলভ্যতা দিন দিন বেড়েই চলছে। দেশে ক্রমবর্ধমান মাদক সমস্যা মোকাবিলার জন্য ১৯৯০ সালে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের অধীনে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ অধিদফতর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর কর্তৃক ১৯৯০ সালে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করা হয়। সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান না থাকলেও বিভিন্ন সূত্র অনুসারে বাংলাদেশে প্রায় ৫০ লাখ মাদক গ্রহণকারী রয়েছে। সরকার ১৯৮৮ সালে ঢাকার তেজগাঁওয়ে ৪০ শয্যাবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় মাদক নিরাময় কেন্দ্রের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে ৫ শয্যার চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করে। সরকারি কেন্দ্রগুলোতে শুধু স্বল্পমেয়াদি ১৪ দিনের নির্বিষকরণ (ডিটক্সিফিকেশন) করা হয়। নির্বিষকরণ কোনো পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা নয়, এটি মাদক চিকিৎসার প্রথম ধাপমাত্র। ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিক্স কন্ট্রোল বোর্ডের (আইএনসিবি) ২০১০ সালের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে আনুমানিক ২ হাজার ৫০০ মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি চিকিৎসা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ ৫০ লাখ মাদকাসক্তের মধ্যে মাত্র শতকরা ০.০৫ ভাগ। দেশে বেসরকারি পর্যায়ে সরকারের লাইসেন্সপ্রাপ্ত চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা ৬৮টি এবং লাইসেন্সবিহীন কেন্দ্রের সংখ্যা অজানা। বেসরকারি পর্যায়ের মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিদফতর ২০০৫ সালে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করে। এ বিধিমালা অনুসারে নিরাময় কেন্দ্র, পুনর্বাসন কেন্দ্র, পরামর্শ কেন্দ্রগুলোকে লাইসেন্স গ্রহণের বাধ্যবাধকতার আওতায় আনা হয় এবং সর্বনিম্ন লাইসেন্স ফি ১০ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা। পক্ষান্তরে একটি মদ বিক্রয়ের বারের লাইসেন্স গ্রহণ করতে লাগে ৫ হাজার টাকা মাত্র।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশের মাদক নিয়ন্ত্রণ চিত্র ও এর ভবিষ্যৎ উদ্বেগজনক। কারণ ইন্টারন্যাশনাল ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ডের (আইএনসিবি) ২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশে মাদকের অপব্যবহার শহর থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে, বিশেষ করে ইয়াবার ব্যবহার। এছাড়া শিশুদের মধ্যেও মাদক গ্রহণের প্রবণতা বেড়ে চলেছে। প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায়, বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত মাদকগুলো হচ্ছে– হেরোইন, ফেনসিডিল, তৃতীয় স্থানে রয়েছে গাঁজা। সম্প্রতি ইয়াবার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলেছে। প্রতি বছর এ দিবসকে কেন্দ্র করে যৎসামান্য অনুষ্ঠানাদি পালিত হলেও সারা বছর মাদক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চোখে পড়ার মতো নয়। এ বছরের মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে– 'মাদক নয়, স্বাস্থ্যই হোক জীবনের নতুন প্রত্যাশা।' আমরা বিশ্বাস করি, সরকার ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা তাদের মাদকবিরোধী কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করবে, যা শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। যা আগামী প্রজন্মের স্বাস্থ্যসহ দেশের সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

ইকবাল মাসুদ : *উন্নয়ন কর্মী, iq.masud@gmail.com*